বাংলাদেশে আইনের শাসনের বর্তমান অবস্থা

আবু ওবায়দুর রহমান, উপ-পরিচালক, লিগ্যাল এডভোকেসি ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (২৬ ডিসেম্বর, ২০১০)

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

এই প্রস্তাবনার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানের ২৬-৪৩ অনুচ্ছেদে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল, সমতা, আইনের আশ্রয় লাভ, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, সম্পত্তির অধিকারসহ ১৮টি মৌলিক অধিকারের বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনোভাবে এর লঙ্ঘন হলে ৪৪ এবং ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের যে প্রাতিষ্ঠানিক আকৃতি থাকার কথা ছিল তা আজও অর্জিত হয়নি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যারা আইন প্রয়োগ এবং যারা আইন প্রণয়ন করেন তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আইন ভাঙ্গেন। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে ক্ষমতায় গেলে সে অভিযোগ আইনের গণ্ডির বাইরে চলে যায়। এ ধরনের চর্চা আইনের শাসন বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়ার অন্যতম আরেক কারণ হচ্ছে ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন। ঐ সময় দেশে আইনের শাসন ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ৫ম ও ৭ম সংশোধনী বাতিল ঘোষণার ফলে ঐ সময় দেশে যে আইনের শাসন ছিল না তা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন হলে মানুষ আশা করেছিল যে, দেশে সত্যিকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে দুটি সরকার ক্ষমতায় থাকলেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তারা কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেনি। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র কর্তৃক সন্তোষজনক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। ২০০২ সালে অপারেশন ক্লিনহার্ট এর নামে ৫৩ ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়। ২০০৪ সালে ক্রসফায়ারায়ের নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পুনরায় সূত্রপাত ঘটে। যা আজও অব্যাহত আছে। তাছাড়া ঐ সময় সরকারদলীয় লোকজনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে।

২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারির ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথচলা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে নির্বিচারে রাজনীতিবিদসহ সাধারন জনগণ হয়রানী এবং নির্যাতনের শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত দুর্নীতিবাজরাও আইনের ফাঁকে পার পেয়ে যায়। বিচারবিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। জরুরি বিধিমালা পাশ করে অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন চাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চলেছিল।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে। দেশের মানুষ আশা করেছিলো যে, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। বিডিআর বিদ্রোহ দমন, যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রক্রিয়া শুরু, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনঃর্গঠনের মতো কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নেতিবাচক উদাহরণও অনেক। নির্বাচনী ইশতেহারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে অঙ্গিকার করা হলেও এটি অব্যাহত আছে । ক্রসফায়ার নেই, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানোর ফলে এ ধরনের মৃত্যু ঘটছে, এ ধরনের যুক্তি দেখিয়ে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন দেয়া হচ্ছে। ২০০৯ নভেম্বর থেকে ২০১০ পর্যন্ত ২২৭ জন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এছাড়া নতুন প্রবণতা হিসেবে নিখোঁজ অথবা গুপ্ত হত্যার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অনেক নিখোঁজ অথবা গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধারের পর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পূর্বেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় ৫৩জন বিডিআর সদস্য আসামী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছে। বিডিআর কর্তৃপক্ষ দাবী করে তারা অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে জানা গেছে নিহত অনেকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে একের পর এক কালো আইন প্রণয়ন করে। আর বিরোধী দল তার সমালোচনা করে। কিন্তু ঐ বিরোধী দল ক্ষমতায় গেলে ঐ কালো আইনকেই ভালো আইন বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সকলেই কালো আইন বলে। অথচ বিগত ৮টি সরকার রদবদল হওয়ার পরও ঐ কালো আইন কেউ বাতিল করেনি। বরং তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং ১৬৭ ধারায় রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ধারা দুটি সংশোধনের নির্দেশ দেয় সরকারকে । কিন্তু অদ্যাবধি ধারা দুটি সংশোধনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়নি। চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হলেও বর্তমান সরকারের সময়ে তাদের বক্তব্য "আদালতের বিচারের বাইরে ক্রসফায়ারের নামে এ ধরনের মৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য নয়।"

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরো একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংস্কৃতি । ১৯৯০ সাল পরবর্তী দেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও প্রতিটি সরকারের আমলে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ বর্জনের ফলে সংসদে জনগণের আশাআকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি এবং এ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কি না সে বিষয়টিও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো বিচার বিভাগ। দেশে বর্তমানে ১৮ লাখ মামলা বিচারাধীন। যার মধ্যে ১২ লাখ ফৌজদারী মামলা। গত ১৫ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় মাত্র ১ শতাংশের সাজা হয়েছে। বাংলাদেশের নেতিবাচক রাজনৈতিক চর্চা হচ্ছে, যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া। বিগত সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও তা অব্যাহত রেখেছে। গত দুই বছরে রাজনৈতিক বিবেচনায় যে ছয় হাজারের অধিক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে তার প্রায় সবই সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের। বিরোধী দলের কোনো নেতাকর্মীর মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। প্রত্যাহার করে নেয়া মামলার অধিকাংশই জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে দায়ের করা হয়েছিল। অথচ সর্বজন স্বীকৃত যে, ঐ সময় বিএনপি আওয়ামী লীগসহ অনেকেই হয়রানীমূলক মামলার শিকার হয়েছিল।

দুর্নীতির সাথে রাষ্ট্রের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বতর্মান সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু তারা দুদক আইন ২০০৪ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে,তার ফলে দুদক সকল কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এ ধরনের বিধান থাকলে দুদক নির্বাহী বিভাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। যা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

সুপারিশঃ

- সংবিধানের অঙ্গীকার গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের মূল্যবোধ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যমত তৈরি করা প্রয়োজন।
- জাতীয় সংসদ কার্যকর করা। সেই সাথে সরকারী ও বিরোধী দলীয় আইন প্রণেতাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সেই সাথে সময়োপযোগী এবং জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পড়ে তোলা।
- সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাধাস্বরূপ এ ধরনের আইন সংস্কার করে জনবান্ধব আইন প্রণয়ন করা।
- নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করে জনগণের সম্মুখে নিজেদের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

সূত্রঃ

১. বাংলাদেশের সংবিধান।
২. ২০১০ এ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি: আসক পর্যালোচনা।
৩. আসক তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট।
৪. সংবিধানের ৫ম সংশোধনী মামলার রায়।
৫. দৈনিক ইনকিলাব (১২.০৮.২০১০)।
৬. দৈনিক সংবাদ (২৮.০৬.২০১০)।
৭. দৈনিক প্রথম আলো (০৩.০৫.২০১০)।
৮. দৈনিক প্রথম আলো (২৭.০৮.২০১০)।
৯. দৈনিক প্রথম আলো (১৭.১২.২০১০)